পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

[সবুজ অর্থনীতির অন্যতম পূর্বশর্ত হলো পরিবেশগত উন্নয়ন যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ নিরসনপূর্বক দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকার 'Vision 2021' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত রাখা, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং দেশের পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs) এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক "Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR)" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন,২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোনস্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ-এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। National Bio-safety Framework বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy & Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।]

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে পৃথিবী নামক গ্রহের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তন, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, বিপদজনক বর্জ্য ও শব্দ দূষণের মত নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে জলমগ্নতা ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা, নদী তীরের ভাঙ্গন, খরা, ভূমিধস এবং কৃষি উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাবের মত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত এ সকল সমস্যা হতে উত্তোরণপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়োটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশন। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল বিশ্বের ১৯১টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। ২০১২ সালে Kyoto Protocol- এর প্রথম Commitment Period শেষ হয়েছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে Kyoto Protocol এর স্বাক্ষরকারী উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক উষ্ণতা

বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবদান মাত্র ২৭ শতাংশ। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, জাপান ও কানাডা Kyoto Protocol থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে Kyoto Protocol এর বৈশ্বিক গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে অবদান মাত্র ১৫ শতাংশে নেমে আসবে। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.১ঃ বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণের বিবরণ

ক্র. নং	দেশ	বার্ষিক মোট CO_2 নির্গমণ,২০১২ (মিলিয়ন মেট্রিক টনস)	শতকরা নির্গমণ
১.	চীন	৮,১০৬.৪৩	২৫.০৮
২.	যুক্তরাষ্ট্র	৫,২৭০.৪২	১৬.৩১
৩.	ভারত	১,৮৩০.৯৩	৫.৬৬
৪.	রাশিয়া	১,৭৮১.৭১	৫.৫১
৫.	জাপান	১,২৫৯.০৫	৩.৮৯
৬.	জার্মানী	৭৮৮.৩২	২.৪৩
৭.	দক্ষিণ কোরিয়া	৬৫৭.০৯	২.০৩
৮.	ইরান	৬০৩.৫৮	১.৮৬
৯.	সৌদী আরব	৫৮২.৬৭	১.৮০
১০.	কানাডা	৫৫০.৮২	১.৭০

উৎসঃ EIA (Energy Information Administration) , ২০১৫ ।

জলবায়ু সম্মেলন

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)-এর আওতায় গত ৩০ নভেম্বর হতে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP21/CMP11) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

নিম্নে প্যারিস বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-২০১৫ এর মূল অর্জনসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- **আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তিঃ** প্যারিস জলবায়ু চুক্তি একটি আইনি বাধ্যবাধকতামূলক সার্বজনীন বিশ্ব দলিল যা পৃথিবীর গ্রীনহাউজ গ্যাসের অন্তত ৫৫ শতাংশ নির্গমণ করে এরূপ অন্তত ৫৫টি দেশ কর্তৃক অনুসমর্থন, গ্রহণ, অনুমোদনের পরই কেবল কার্যকর হবে।

- **তাপমাত্রা সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রাঃ** সম্মেলনে বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিক বিপদাপন্ন দেশগুলোর তীব্র দাবির মুখে প্যারিস চুক্তিতে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ নিচে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে প্রচেষ্ঠা গ্রহণের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন 'নেট জিরো' অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থাঃ** প্যারিস বিশ্ব চুক্তি এবং এতদসংক্রান্ত COP21 সিদ্ধান্তের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা শিথিল করাসহ আর্থিক, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- **অভিযোজনঃ** প্রথমবারের মত অভিযোজনের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা (Global Goal on Adaptation) গৃহীত হয়েছে।

- **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজঃ** উদ্বাস্তু ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির অধিকার প্যারিস এগ্রিমেন্ট-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। Loss and Damage বিষয়টির জন্য Early Warning System, Emergency Preparedness, Comprehensive Risk Assessment and Management এবং Risk Insurance Facility - এর জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

- **অর্থায়নঃ** উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ, এলডিসি, সিডস (SIDS)-এর রাষ্ট্রসমূহকে অভিযোজনের জন্য public fund এবং অনুদান ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

- **প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** প্যারিস এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে প্রযুক্তির উন্নয়ন, সমৃদ্ধকরণ এবং হস্তান্তরের লক্ষ্যে আরো কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ক্লাইমেট টেকনোলোজি সেন্টার এন্ড নেটওয়ার্ক (CTCN)-কে অনুরোধ করা হয়েছে এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কনভেনশনের আওতায় উন্নয়নশীল বিশেষ করে এলডিসিভুক্ত এবং বিশেষভাবে বিপদাপন্ন দেশসমূহের কথা উল্লেখপূর্বক প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রচার ও স্থাপন এবং জলবায়ু অর্থায়নে অধিগত করার ক্ষমতা সহজতর করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিটি পৃথিবীর সকল দেশ কর্তৃক অভিনন্দনের সাথে গৃহীত হয়েছে। চুক্তিটি ২২ এপ্রিল, ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর সফল কার্যকারিতা নির্ভর করবে সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক এই চুক্তি স্বাক্ষর ও এর যথার্থ বাস্তবায়নের উপর।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে ও সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির নাজুক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাযথ ও পরিকল্পিত সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু নীতি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছেঃ

- National Adaptation Programme of Action (NAPA) (2005 and revised 2009)
- Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) (2009)
- Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) প্রণয়ন
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়ে Climate Change Unit প্রতিষ্ঠা

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট তিনটি তহবিল গঠন করা হয়েছেঃ

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Bangladesh Climate Change Trust Fund-BCCTF):** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটমান বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন এবং স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন বিবেচনা করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে এ তহবিলে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে এবং চলতি অর্থবছর পর্যন্ত ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০৯ সালের শুরুতে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা তৈরি করে এবং এর ধারাবাহিকতায় মে, ২০১০ এ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন কার্যকর হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকারি ৩৩৪ টি প্রকল্পে প্রায় ২৪৩০.০৯ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ৬৩ টি প্রকল্পের জন্য পিকেএসএফ এর অনুকূলে ২৫.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে সরকারি ৯৩টি প্রকল্প এবং ৫৭টি এনজিও প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা তহবিল (Bangladesh Climate Change Resilience Fund-BCCRF):** Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) কে সহায়তা করা ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার তহবিল যোগানোর জন্য ৪টি উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলটি মূলত ২০০৮ সালে Multi Donor Trust Fund (MDTF) নামে যাত্রা শুরু করেছিল। পরবর্তীতে আরও ৩টি উন্নয়ন সহযোগী BCCRF এ ট্রাস্ট ফান্ডে যোগদান করে। বর্তমানে BCCRF-এ অনুদান প্রদানকারী সাতটি উন্নয়ন সহযোগী হল: ডিএফআইডি, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইইউ, সুইজারল্যান্ড, অসএইড এবং ইউএসএইড। BCCRF এর ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাংক অনুদান প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কারিগরী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করবে। উন্নয়ন সহযোগী হতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অনুদানের মোট পরিমাণ ১৮৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। BCCRF এর আওতায় অদ্যাবধি ৮ টি প্রকল্পে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২টি, বন অধিদপ্তরের ১টি, এলজিইডি'র ১টি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১টি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১টি, পিকেএসএফ'র ১টি, IDCOL ১টি) মোট ১৫৩.৮ মি. ডলার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতার জন্য কৌশলগত কর্মসূচি (Strategic Programme for Climate Resilience (SPCR) Bangladesh):** ২০১০ সালের অক্টোবরে MDB হতে বাংলাদেশের জন্য ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (এর মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ ৬০ মিলিয়ন ডলার ও অনুদান ৫০ মিলিয়ন ডলার) তহবিল অনুমোদিত হয়। এর আওতায় পিপিসিআর-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এলাকায় অভিযোজনমূলক (adaptation) পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ তহবিলের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের দায়িত্বে রয়েছে বিশ্বব্যাংক ও আইএফসি এবং তদারকির প্রধান দায়িত্বে রয়েছে এডিবি।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক "Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR)" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি

টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (MDGs) অন্যতম একটি লক্ষ্য। উন্নয়নের পদ্ধতি/কৌশলকে দেশের নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহের সঙ্গে সমন্বিতকরণ এবং এর মাধ্যমে পরিবেশগত সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস (লক্ষ্য ৭ক) এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এ লক্ষ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)–এর "Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2015" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৭ নং এমডিজি এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারণি ১৫.২ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.২ঃ পরিবেশ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ	ভিত্তি বৎসর ১৯৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা
লক্ষ্য ৭ খঃ জীববৈচিত্র্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, ২০১০ এর মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসকরণ			
৭.১ বনভূমি মোট ভূমির শতকরা অংশ (বৃক্ষের অংশ)	৯.০	১৩.৪০ (DOF ২০১৪) বৃক্ষের ঘনত্ব>৩০%	২০.০ বৃক্ষের ঘনত্ব>৭০%
৭.২ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণ (মাথাপিছু মেট্রিক টনস)	০.১৪	০.২৩ (DOE ২০১৩)	

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ	ভিত্তি বৎসর	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর

	১৯৯১		লক্ষ্যমাত্রা
৭.৩ ওজোন (ozone) হ্রাসকারক সিএফসি গ্রহণ (ODP টনস)	২০২.১	৬৪.৪৪ (DOE ২০১৩)	৬৫.৩৯
৭.৪ মৎসের মজুদ নিরাপদ জীব ব্যাপ্তির শতকরা অংশে		৫৪ অভ্যন্তরীণ ১৬ সামুদ্রিক	
৭.৫ মোট ব্যবহারকৃত পানি সম্পদ এর শতকরা হার		২.৯ (UNSD ২০১ ০)	
৭.৬ সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা পৃথিবীর (terrestrial) মোট সংরক্ষিত এলাকার শতকরা অংশে		১.৮৩% (Tere.) ১.৩৪% সামুদ্রিক (BFD ২০১৩)	৫.০
৭.৭ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকাযুক্ত জীবকুলের শতকরা অংশ		ক ০.২৩% মেরুদন্ডী (IUCN ২০০৩) খ.৫.৮১% উদ্ভিদ(BNH ২০১৩)	
৭.৮ উন্নত সুপেয় পানি ব্যবহারকারীদের শতকরা হার	৭৮	৯৭.৯ (MICS ২০১৩) ৯৮.৫ (SVRS ২০১৩)	১০০
৭.৯ স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সুবিধা ব্যবহারকারীদের হার	৩৯.০০	৫৫.৯ (MICS ২০১৩) ৬৪.২ (SVRS ২০১৩)	১০০
৭.১০. শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের হার		৫.২৫ (বিবিএস ২০১৪)	

উৎস: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি প্রতিবেদন-২০১৫, ইউএনডিপি ও পরিকল্পনা কমিশন,
* DOF=Department of Forest, DOE=Department of Environment ,
MICS=Multiple Inndicator Cluster Survey, SVRS=Sample Vital Registration System.

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মেয়াদ ২০১৫ সালের শেষে নতুন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা (The Future We Want) নিয়ে ২০১৪ সালের ১৯ জুলাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশন শুরু হয় ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে এবং শেষ হয় ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসে। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (Sustainable Development Summit)একটি চূড়ান্ত দলিল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) তৈরী হয়, যার দাপ্তরিক নাম হলো Tranforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)' 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি)'কে প্রতিস্থাপন করবে যা ২০১৫-২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর ১৭ টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি উদ্দেশ্য রয়েছে। ১৭টি মূল লক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে-দারিদ্র, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার ইকুইটি, পানি, শক্তি (জ্বালানি), অর্থনীতি,অবকাঠামো, বৈষম্য (Inequality), বাসস্থান (Habitation), ভোগ(Consumption), জলবায়ু, সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান (Marine-ecosystems), বাস্তুসংস্থান (Ecosystems), প্রতিষ্ঠান ও স্থায়িত্ব (Sustainability)। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অভিযোজন ও প্রশমন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অভিযোজন (adaptation) ও প্রতিকারমূলক (mitigation) কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এখানে উল্লেখ্য যে , অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সকল নীতি, কৌশলপত্র, প্রকল্প ইত্যাদির আলোকে

প্রয়োজনীয় ও যথাযথ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংদেনিং দি এনভায়রনমেন্ট,ফরেস্ট্রি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটিজ অব দি মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্টস এন্ড ইটস এজেন্সিজ' শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ আউটপুট হিসেবে বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan-CIP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫টি গ্রুপে (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন; বনসম্পদ; কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা; অর্থনীতি ও অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং জেন্ডার) ভাগ করে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নীতি/আইন/কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক সক্ষমতা, দ্বৈততা, পরস্পর বিরোধিতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রকল্প চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। CIP প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেমনঃ Departmental Focal Points Committee, CIP-Technical Advisory Groups, Ministerial Working Groups ইত্যাদি। CIP এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা, পেশাজীবী, সাধারণ জনগণ সকলের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে বৃহত্তর পরামর্শ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। CIP এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা, পেশাজীবী, সাধারণ জনগণ সকলের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই জাতীয় পরামর্শক কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম

বায়ু দূষণ মনিটরিং

- ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (Clean Air & Sustainable Environment- CASE)- প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে । প্রকল্পের অধীন বায়ু দূষণ মনিটরিং, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরের বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী ও খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন চালু রয়েছে।
- এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুকণা পরিমাপের আওতায় এসপিএম, পিএম১০, পিএম ২.৫ পরিবীক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
- ২০১৪ সালে সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা ১০ ও বস্তুকণা ২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবং প্রায়শই নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসূমে ইটের ভাটা সমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে এই কারণে রাস্তাঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমানে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন ২০১০) অনুসারে যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টির জন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা যায়। এছাড়া মটরযান আইন, ১৯৮৩ এর আওতায় পুলিশ প্রশাসন জরিমানা আদায় করতে পারে। ডিজেল চালিত পুরাতন মোটরযান বস্তুকণা নিঃসরণের (Particulate Matter) আরেকটি প্রধান উৎস। যানবাহন সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ীর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ:

- **ইটভাটা স্থাপন আইন যুগোপযোগি করণ:** বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ। ইটভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট ভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী, বায়ু দূষণরোধে কার্যকরী ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে ''ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩'' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে পুরাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন্ (Hybrid Hoffman Kiln), জিগজ্যাগ কিল্ন (Zigzag Kiln), ভার্টিক্যাল স্যাফট ব্রিক কিল্ন্ (Vertical Shaft Brick Kiln), টানেল কিল্ন্ (Tunnel Kiln) বা পরীক্ষিত অন্য কোন উন্নত পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে ইট পোড়ানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

- **আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রুপান্তর:** পুরাতন পদ্ধতির সকল ইটভাটাকে ৩০জুন ২০১৪ খিঃ হতে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রুপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে দেশে ৪০৯১ টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎ প্রায় ৬১ শতাংশ ইটভাটা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম:

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ দূষণের মাত্রা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের মধ্যে রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা (ETP – Effluent Treatment Plant), শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা (Sound Barrier), বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা (ATP – Air Treatment Plant) স্থাপনসহ সকল প্রকার Mitigation Measures বাস্তবায়ন করার পর এবং নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার শর্তসাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুতল আবাসিক ভবনসমূহে Rain Water Harvesting ব্যবস্থা ও পয়:বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (STP – Sewage Treatment Plant) স্থাপনের এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (Zero Discharge Plan) গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হচ্ছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ মূলক কার্যক্রম

- **ইটিপি (ETP) স্থাপন:** পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP – Effluent Treatment Plant) স্থাপনে বাধ্য করতে পরিবেশ অধিদপ্তর অধিকহারে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইটিপি আছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১১৩ টি এবং ইটিপি বিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৬৯ টি।

- **এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:** পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর অধীন পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ২,১১২ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ২০৩.০৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপপূর্বক ১৩১.৭৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং একই সাথে দূষণকারী ২৯ টি কারখানা সীলগালা ও ২০ টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ/গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণের দায়ে অদ্যাবধি ৬০২ টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

- **নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান:** নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সসমূহ নিয়মিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ উচ্ছেদ বা কারখানার মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে সর্বমোট ১,৬২৩ টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ১০৮.২ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ ও প্রায় ১.২ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া জনসচেতনা সৃষ্টির পাশাপাশি পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত বাজার ঘোষণার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বাজারকে পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিক এর তত্বাবধায়নে রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পসমূহকে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণের বিষয়ে সকল শিল্প মালিকদের চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

- বৃহত্তর ঢাকা জেলায় শিল্প কারখানার সংখ্যা ও দূষণের মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ু দূষণ সংশ্লিষ্ট 'সার্ভে এন্ড ম্যাপিং অব এনভায়রনমেন্টাল পল্যুশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ ইন গ্রেটার ঢাকা এন্ড প্রিপারেশন অব স্ট্র্যাটেজিস ফর ইটস মিটিগেশন' শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। শব্দ দূষণ রোধ ও শব্দ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে '' Survey of Noise Level in Seven Divisional Headquarters Under the Integrated and Participatory Program to Control Noise Pollution '' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ।

পানি ও পরিবেশ

ইকোসিষ্টেমকে সচল ও উৎপাদনমুখী রেখে নদী আমাদের দেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ মোতাবেক দেশের প্রধান প্রধান নদী যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ধলেশ্বরী, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানির গুণগত মান সারা বছরই গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে। কিন্তু ঢাকার পারিপার্শ্বিক নদীসমূহে যেমন বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর পানির গুণগতমান গ্রহণযোগ্য সীমার বাইরে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীতে পানি প্রবাহ খুব কম থাকে তখন কোন কোন স্থানের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ শূন্য থাকে যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়। এ জন্য এ সকল নদীর প্রতিবেশগত অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর 'ফোরশোর' এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে নদীর পানির মান মনিটরিং করে আসছে। ২৭টি নদীর পানি ৬৩টি স্থানে মনিটরিং করা হয়। মনিটরিং প্যারামিটারগুলি হলোঃ pH, Chloride, Turbidity, Total Dissolved Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD)।

উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বড় বড় নদী যেমন, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO, BOD এবং COD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শুন্য। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চ মাত্রার BOD ১৩২ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিচে), COD ২১৯ মি:গ্রি:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ২০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত), Chloride ৪০০ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ৬০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) এবং TDS ৭৮২ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ২১০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) পাওয়া যায়।

২০১৪ সালে ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গিয়েছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ১২,৬৪৬ মি:গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ৬০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) এবং TDS ১৫,৫০০ মি: গ্রা:/লি: (গ্রহণযোগ্য মান ২১০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে বেশি Turbidity লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ Turbidity-র কারণে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় ফলে একদিকে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে river bed এ পলি জমে। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity 136.3 NTU (গ্রহণযোগ্য মান ১০ NTU পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে। কর্ণফুলি নদীতে ৩৫৩ মি:গ্রা:/লি: এর বেশী COD (গ্রহণযোগ্য মান ২০০ মি:গ্রা:/লি: পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে। হালদা নদীর DO এবং BOD পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এবং জোয়ারের সময় ক্লোরাইডের মাত্রা কিছুটা বেশি ছিল।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান হালনাগাদ: জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান হালনাগাদ করার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- **গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন:** হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে এলাকার জনগণকে সংগঠিত করে সর্বমোট ৭৪টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG) গঠন এবং দলগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

- **ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণ:** কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়া দ্বীপ, খুরুশকূল রাস্তারপাড়া এবং টেকনাফ এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন (প্যারাবন) সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া নুনিয়ারছড়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সৃজিত এবং সংরক্ষিত প্রায় ৪০০ একর আয়তনের ম্যানগ্রোভ বন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে জানমাল সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- **জলজ বন সৃজন ও সংরক্ষণ:** হাকালুকি হাওরে ৫০০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ এবং ১০ হেক্টর জলজ বন সৃজনের মাধ্যমে হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, বর্ষা মৌসুমে জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও শুষ্ক মৌসুমে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস।

- **বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা:** হাকালুকি হাওরে বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও মৎস সম্পদসহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯টি জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- **সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ:** প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওর এলাকার বসতবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (জীবনিরাপত্তা চুক্তি)-এর অংশীদার। চুক্তির বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো (National Biosafety Framework) বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ জারি করা হয়েছে।

এ-ছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম:

(১) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে সামুদ্রিক কাছিম সংরক্ষণ

(২) হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

(৩) হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে বৃক্ষরোপণ

(৪) সেন্টমার্টিন দ্বীপে কোরাল সংরক্ষণ

(৫) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জনগণের মাঝে জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব উন্নত চুলা বা বন্ধুচুলা প্রচলন

(৬) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সোনাদিয়া দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে বালিয়াড়ি সংরক্ষণ

(৭) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জনগণের বসতবাড়িতে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন

(৮) জরুরি সংরক্ষণ কাজ এবং এনফোর্সমেন্টসহ প্রয়োজনীয় কাজের জন্য হাকালুকি হাওর ও কক্সবাজার এলকার ১০টি উপজেলা ইসিএ কমিটিকে ১ কোটি টাকা Endowment Fund প্রদান

(৯) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার জনগণকে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজনে ও প্রশমনে সচেতন করে তোলা।

বনের জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসাবে ঢাকার অদূরে 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, গাজীপুর' এবং কক্সবাজার এ 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, কক্সবাজার' নামে দুইটি বণ্যপ্রাণী সাফারী পার্ক এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় 'শেখ রাসেল এভিয়ারী ইকো-পার্ক ছাড়াও ১৭টি জাতীয় উদ্যান, ২০ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য দুইটি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষনা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গাছ আহরণ বন্ধ রাখা ছাড়াও সৃজিত বনায়নের পুরাতন গাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকারি খাস জমির প্রাকৃতিক গাছ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বন্যপ্রানী নিধন ও পাচার এবং ক্রয় ও বিক্রয় রোধে পুলিশ, কাষ্টমস, কোস্টগার্ড ও বনবিভাগ সমন্বয়ে গঠিত বন্যপ্রানী ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ধারা ২০(১) এর ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় ১,৭৩৮.০০ বর্গকিলোমিটার এর মেরিন প্রটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখার মাধ্যমে সুন্দরবনের পর্যটন আকর্ষণ ক্ষমতা যাতে আবহমান কাল রক্ষা করা যায় সেই লক্ষ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক। যাতে করে সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা কোনভাবেই বহন ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। যেমনঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর প্রকল্প,শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রকল্প , স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন প্রকল্প,বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।

অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ১৯টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং সামাজিক বনায়নের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। রক্ষিত এলাকাসমূহের প্রবেশ ফি হতে অর্জিত আয়ের ৫০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বরাদ্দ করা হচ্ছে।

ওজোনস্তর সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং প্রটোকলের লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীসমূহ যথাক্রমে ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও ২০১০ সালে অনুমোদন করে। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী ওজোন ক্ষয়কারী সিএফসি-এর পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ ১৯৯৯ সালের ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এবং ২০১০ সালে তা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমান প্রটোকল অনুযায়ি এইচসিএফসি ফেইজ আউটের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে 'ওজোন সেল' গঠন করা হয়েছে এবং মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

- ওডিএস এর আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত ১৯৯৪ থেকে প্রতিবছর দেশব্যাপী জরিপের মাধ্যমে হালনাগাদকরণ এবং রিপোর্টিং করা হচ্ছে;
- ওডিএস এর আমদানি ও ব্যবহার এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের জন্য ''ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৪'' জারি করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত হয়েছে;
- ওডিএস সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নকারী এবং নীতি নির্ধারকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে 'Promotion of Ozone Layer Protection in Bangladesh' ও 'Implementation of Montreal Protocol in Bangladesh' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ৬০০ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- 'Good Service Practices in Refrigeration and Air conditioning' ও 'Green Trade for the Protection of Ozone Layer' শীর্ষক দুটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাক্রমে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে প্রায় ৫,০০০ টেকনিশিয়ান এবং ৩০০ জন কাস্টমস ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আমদানির ক্ষেত্রে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী সনাক্তকরণের লক্ষ্যে শুল্ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সনাক্তকারী যন্ত্র (Identifier) সরবরাহ করা হয়েছে;
- ঔষধ শিল্পে Metered Dose Inhalers (MDIs) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য সিএফসি-১১ ও সিএফসি-১২ ফেজ আউট করার লক্ষ্যে UNEP ও UNDP এর সহায়তায় এবং মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের অর্থায়নে Transition Strategy ও Conversion Project বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধ শিল্প হতে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে মিটারড ডোজ ইনহেলার প্রস্তুতিতে সিএফসি সম্পূর্ণরূপে ফেজ আউট করা হয়েছে;
- রেফ্রিজারেশন সেক্টরে সিএফসিযুক্ত রেফ্রিজারেটরকে সিএফসিমুক্ত রেফ্রিজারেটরে কনভার্ট করার লক্ষ্যে রেট্রোফিট কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ২,০০০ টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- রেফ্রিজারেটর রিট্রোফিট কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সারা দেশে প্রায় ৮০০ জন ওয়ার্কশপ মালিকদের মাঝে রিট্রোফিট টুলস ও ইক্যুইপমেন্ট বিতরণ করা হয়েছে;
- ফোম সেক্টর হতে HCFC-141b ফেজ আউট করার লক্ষ্যে মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কনভারশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে রেফ্রিজারেটর ফোম তৈরিতে HCFC-141b সম্পূর্ণরূপে ফেজ আউট করা হয়েছে;
- HCFC Phase-out Management Plan (Stage-1) প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কাস্টমস কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ৩৩ জন কর্মচারিকে ''Green Trade for the Protection of the Ozone Layer'' শীর্ষক কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত শিক্ষক,

প্রকৌশলী ও প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে ৩টি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১,৬৯০ জন টেকনিশিয়ানকে "Good Service Practices" বিষয়ক কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ মূলত নীতিনির্ধারণী উদ্যোগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের তদারকী, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুণঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী। বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১১ এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন্স জারি করে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রথম নীতি নির্দেশনা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বমোট ২৩৩.৫৭ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন করেছে। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২৭,৫৪৪টি রেটিংকৃত প্রকল্পের মধ্যে ২২,৪৯২টি প্রকল্পে মোট ১,০৪৬.৫৩ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে। সৌর শক্তি, বায়ো-গ্যাস প্লান্ট, এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুণঃঅর্থায়ন স্কীম তৈরি করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত এ পণ্য তালিকা ৫০টিতে উন্নীত করা হয়। উক্ত পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলো হলো- সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ওয়েস্ট হিট রিকভারী সিস্টেম এবং ব্যবহৃত লেড এসিড ব্যাটারি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ। এছাড়াও, পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের আওতায় সবুজ অর্থায়নের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কনভেনশনাল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় 'ইটভাটার দক্ষতা উন্নয়নের অর্থায়ন প্রকল্প' শিরোনামে ২০১২ সালে একটি স্কীম চালু করা হয় যার উদ্দেশ্য হলো উপযুক্ত প্রযুক্তি ও জ্বালানি ব্যবহারের পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের মধ্য দিয়ে গ্রিন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমণ হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধ। এ তহবিলে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা দু'ভাগে বিভক্তঃ প্রথম ভাগ প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা ব্যবহৃত হচ্ছে ফিক্সড চিমনি কিল্নকে উন্নত জিগজ্যাগ কিল্নের রূপান্তরকরণে এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রায় ২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন ভার্টিকাল শ্যাফট ব্রিক কিল্ন, হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন এবং টানেল কিল্ন স্থাপনে। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত এ তহবিলের আওতায় ৩৫টি ব্যাংক ও ১৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের (ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) ২টি উপ-প্রকল্পে ৬৮.৬৫ কোটি টাকা (৮.৮৩ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সমপরিমাণ) বিতরণ করা হয়েছে।

বন সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। সারণি ১৫.৩ এ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.৩ঃ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র/পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	দেশের নাম	মোট ভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	মোট বনভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	বনভূমি কভারেজ (%)
১.	আফগানিস্তান	৬,৫২,৮৬০	১৩,৫০০	২.০১
২.	বাংলাদেশ	১,৩০,১৭০	১৪,২৯০	১১.০০
৩.	ভুটান	৩৮,১১৭	২৭,৫৫০	৭১.৮০
৪.	ভারত	২৯,৭৩,১৯০	৭,০৬,৮২০	২৩.৭০
৫.	পাকিস্তান	৭,৭০,৮৮০	১৪,৭২০	২.০০
৬.	মালদ্বীপ	৩০০	১০	৩.৩০

ক্রমিক নং	দেশের নাম	মোট ভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	মোট বনভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	বনভূমি কভারেজ (%)
৭.	নেপাল	১,৪৩,৩৫০	৩৬,৩৬০	২৫.৪০
৮.	শ্রীলংকা	৬২,৭১০,	২০,৭০০	৩৩.২০

উৎসঃ http://data.worldbank.org/indicator,২০১৫

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা জোরদার তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও কৃষি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮টি চলতি উন্নয়ন প্রকল্প (৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি প্রকল্প) বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে যার অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৩০৫.০৪ কোটি টাকা। এছাড়া বরাদ্দবিহীনভাবে ৬ টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জুলাই, ২০১৫ হতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮.০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৯ শতাংশ।

সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম যা গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা,জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজনে এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ন ভূকিা রাখছে। ১৯৮১ সাল হতে এ পর্যন্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের এবং কর্মসূচির আওতায় ৬,৮৪২ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬২৬ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান এবং ৩.০৮ লক্ষ চারা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সামাজিক বনায়নের আওতায় ৫,৪৩৫ জন উপকারভোগীকে তাদের লভ্যাংশ বাবদ ২৩.৭৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৫ লক্ষ এর বেশি উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে নগদ ২৫৮.৪৯ কোটি টাকা ১,১৫,৩০৪ জন দরিদ্র উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ (২০১০ এ সংশোধিত) অনুসরণ করা হয়। এ কার্যক্রমটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ব্যাপক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। হারবেরিয়াম কর্তৃক দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা "ফ্লোরা অব বাংলাদেশ" সিরিজ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দেশের ভেষজ সম্পদ, উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষসম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক ও সুষ্ঠু পরিচর্যার মাধ্যমে এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে হারবেরিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রম (Botanical Survey Activities), উদ্ভিদ সনাক্তকরণ (Plant Identification), উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ (Plant Specimen Preservation), সনাক্তকরণকৃত উদ্ভিদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ, Flora of Bangladesh প্রকাশনা কার্যক্রম, উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুনভাবে নথিভুক্তকরণ (New Record) ইত্যাদি কার্যাবলী বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, “রেড ডাটা বুক অব ভাসকুলার প্লান্টস অব

বাংলাদেশ, ভলিউম-২” শীর্ষক কর্মসূচিটি ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে “রেড ডাটা বুক অব ভাসকুলার প্লান্টস অব বাংলাদেশ, ভলিউম-৩” প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০, ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ এর আইলা এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা উল্লেখ্যযোগ্য। দেশের জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অন্যতম ‘ভিশন’ হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

(ক) প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

- আইসিটি নির্ভর মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ ভূমিকম্পের ঝুঁকিমুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভুমিকম্পজনিত বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের বড় তিনটি শহর যথাঃ ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট এর মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। দেশের ঝুঁকিপূর্ণ আরো ৬টি শহর যথাঃ ময়মনসিংহ, টাংগাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং রংপুরের মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সকল বিল্ডিং এর ওপর জরিপ করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

(খ) আইন, নীতি, বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে যথাযথ আইনি কাঠামো দেয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে প্রতিপালন এবং নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণীত হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত আপদগুলো অন্তর্ভুক্ত করে ২০১০ সালে স্ট্যান্ডিং অর্ডাস অন ডিজাস্টার্স (এসওডি) সংশোধন করা হয়। সম্প্রতি এসওডি’র বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে;

- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ করা হয়েছে;

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে;

(গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- জাপানের সেনদাই নগরীতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে ১৮৭টি দেশের উপস্থিতিতে "সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিক্স রিডাকশন" গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SAARC সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan of Action for Disaster Management) তৈরিতে সহায়তা করা হয়েছে;

- ২০১০ থেকৈ ২০১৫ সালের জন্য প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, তিতাস, টিএন্ডটি, ওয়াসা এর কন্টিনজেন্সী প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে।

- দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনআনডেশন ম্যাপ/রিস্ক ম্যাপ ফর স্টর্ম সার্জ তৈরি করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ঝুঁকি মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে এবং রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে।

- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে Incident Management System সংক্রান্ত গাইড লাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া Debris Management গাইড লাইন প্রয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটির জন্য পৃথক Debris Management Plan , Debris Management Guidelines ও Dead Body Management Plan প্রস্তুতের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে।

(ঘ) সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অর্নাস ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাস্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।

- সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঙ) প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিও (যেমনঃ নারী কনসোর্টিয়াম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এ্যাকশন এইড-র সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের জন্য Solar Photoboltaic System and Application শীর্ষক প্রায়গিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ইনষ্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।
- জেলা ত্রাণ ও কর্মচারীদের (ডিআরআরও) সম্মেলনে সারাদেশ হতে আগত কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে ;
- তিন জন ডিআরআরও এবং ২২ জন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)সহ মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দুই মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ অব্যাহতভাবে চলমান থাকবে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মোট ৩,২০০ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৩৮টি জেলায় মোট ১,৯০০ জন কর্মচারীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কর্মচারীগণকে জুন/২০১৬ সনের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় Damage and Need Assessment (DNA) Cell স্থাপন করা হয়েছে এবং দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের SoS এবং D-Form Online এ পুরণ করার নিমিত্ত Damage and Need Assessment (DNA) Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে এবং ইতোমধ্যে ১৯ টি জেলার মোট ১৮৩ জন কর্মকর্তাকে SoS এবং D-Form Online-এ পুরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মার্চ-এপ্রিল ২০১৬ মাসের মধ্যে সকল জেলায় DNA Software স্থাপন করে কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessement (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপি ৮টি বড় ধরনের আপদের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস,ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রনয়ন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে MRVA কার্যক্রমের উপর দিনব্যাপী একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মার্চ-এপ্রিল ২০১৬ মাসের মধ্যে সকল জেলায় MRVA Mapping বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

(চ) দুর্যোগ প্রশমন,যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ "Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other Disasterss" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ৬৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের ২য় ফেজে আরও ১৫৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ECRRP, D1 প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় জরুরী সাড়া প্রদানের জন্য ১২ টি পিকআপ ভ্যান, সিডর বিধ্বস্ত ১২টি জেলা ও ৩৫টি উপজেলায় ব্যবহারের জন্য মেগাফোন সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ৬টি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্স, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট এবং ৪টি Rough Sea Aquatic Search & Rescue Boat ক্রয় করে উপকূলীয় ১২টি জেলা প্রশাসন, কোষ্ট গার্ড ও র‍্যাব-কে দেয়া হয়েছে।

- ঢাকা ও সিলেট শহরে আরবান রেজিলিয়েন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ১২০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮১কোটি টাকা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যের সঙ্গে সম্পৃক্তদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনষ্টিউট স্থাপন ও NDRCC শক্তিশালীকরণ খাতে ব্যয় করা হবে।

- ছোট ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণঃ গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিগত পাঁচ বছরে এ অধিদপ্তর কর্তৃক সমতল ভূমিতে ২,০৮৮ টি এবং পার্বত্য এলাকায় ৫০৭ টি সর্বমোট ৪,৫৯৫টি ছোট ছোট (১২মিটার পর্যন্ত) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬১টি জেলার ৪৬০টি উপজেলায় ৭৯০টি (৯,২৯১ মিঃ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত ৭৯০টি সেতু/কালভার্টের মধ্যে ৭৮৫টি কার্যাদেশ ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশকৃত সেতু/কালভার্টের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

(ছ) ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ

- সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করার লক্ষ্যে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১০টি জেলায় এবং ৪৮টি উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে।

- স্কুলকে দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত রাখতে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের ৩০ হাজার প্রাথমিক ও ৬ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে ১ বার করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুলে মহড়া অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য ১৪,০০০ প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, ১,২০০ জন শিক্ষা কর্মকর্তা ও পরিদর্শককে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

- ১৪ টি কমিউনিটি রেডিও সেন্টারের সম্প্রচারিত মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সতর্কবার্তা প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের শ্রোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ১,২০০ টি পকেট রেডিও প্রদান করা হয়েছে।

- ১,৭০০ টি ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন তথ্যপত্র প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয় অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে DRR, CCA template প্রস্তুত করে NILG-কে প্রদান করা হয়েছে।

- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমিকম্প পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, দুর্যোগ পরবর্তী সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জরুরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (Health crisis management centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- বর্তমানে ১০ টি মডেল ফায়ার ষ্টেশন স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

- প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ ও রেট্রোফিটিং সেল স্থাপনের মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট্রোফিটিং বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- সিডিএমপি প্রকল্পের আওতায় এলিডিআরআরএফ এর আওতায় ৪০ জেলার, ১০৯ টি উপজেলার, ৩২২টি ইউনিয়নের গ্রামীণ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুকিঁ হ্রাসে এ পর্যন্ত ১,৯৫৩ টি ক্ষুদ্র স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১,১২৩ টি ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ৮৩০ টি স্কীম চলমান রয়েছে।

দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ সংকেত এবং জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিপ্রবণ দেশ। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা অন্যতম। আগাম সর্তকবার্তা দুর্যোগের ঝুঁকি বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে অত্যন্ত সহায়ক। দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রদানে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতীতের চেয়ে বর্তমানে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলকভাবে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে দুর্যোগ বার্তা প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রচার পদ্ধতি (Cell Broadcasting System)ঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রচার পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ অক্ষরবিশিষ্ট বার্তা সাফল্যজনক প্রচার করার পর গ্রামীনফোন নেটওর্য়াক-এর

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন-এর মাধ্যমে ৮০ অক্ষরবিশিষ্ট বার্তা প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ১২০ অক্ষরবিশিষ্ট বার্তা বাংলাভাষায় (বাংলা ফন্ট ব্যবহার করে) প্রচার করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(খ) ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)ঃ আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও আগাম সতর্কবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে Interactive Voice Response (IVR) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯৪১ কোড ডায়াল করে তারপর ১ ডায়াল করলে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা; ২ ডায়াল করলে নদী বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক বার্তা; ৩ ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা; ৪ ডায়াল করলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত এবং ৫ ডায়াল করলে নদ/নদীর পানি হ্রাস ও বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাবে। উল্লেখ্য সম্প্রতি ১০৯৪১ কোডের পাশাপাশি টোল ফ্রি ১০৯০ শর্ট কোড চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেলিটক মোবাইলে ইতোমধ্যে ১০৯০ কোডও চালু করা হয়েছে।

(গ) মোবাইল ক্ষুদ্র বার্তা বা Short Message Service (SMS)ঃ মোবাইল ক্ষুদ্র বার্তা মন্ত্রণালয়ের- (১) দুর্যোগের সকল কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত, (২) অভ্যন্তরীণ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং (৩) গণসচেতনতা ও প্রচার মাধ্যমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সহায়তা করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যে কোন ক্ষুদ্র বার্তা যে কোন মোবাইল ব্যবহারকারীকে খুব অল্প সময়ে পাঠানো সম্ভব। এই লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবদের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করেছে।